ফল ও মসলা চাষ

ইউনিট ৩

ভূমিকা

আমাদের দেশ খাদ্যে শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও পুষ্টির চাহিদা পূরণে ফল চাষ উৎপাদনের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন প্রকার খনিজ ও ভিটামিনে সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হচ্ছে ফল। ফলজাত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হচ্ছে যা মানুষের কর্মসংস্থানে ও আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্রে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামাজিক কর্মকান্ডে ফল ব্যবহার হয়। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে জন প্রতি ১১৫ থেকে ১২৫ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমরা খেতে পারছি মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ গ্রাম। বিদেশী ফলের আমদানি কমিয়ে আমাদের প্রচলিত এবং অপ্রচলিত সব ধরনের ফলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। সুগন্ধিযুক্ত গাছ বা গাছের অংশবিশেষ এবং গাছ কর্তৃক উৎপাদিত বস্তুকে মসলা বলে। আমাদের দেশের প্রধান মসলাগুলো হলো পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ, হলুদ, আদা, তেজপাতা, ধনিয়া, জিরা ইত্যাদি। ফল, ফুল ও মসলার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এই ইউনিটে কুল, পেয়ারা, কমলা, পিঁয়াজ, রসুন ও আদা চাষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৩.১ : ফল ও মসলা ফসলের গুরুত্ব
পাঠ - ৩.২ : কলা চাষ
পাঠ - ৩.৩ : পেয়ারা চাষ
পাঠ - ৩.৪ : পিঁয়াজ চাষ
পাঠ - ৩.৫ : রসুন চাষ
পাঠ - ৩.৬ : আদা চাষ

পাঠ-৩.১ ফল ও মসলা ফসলের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফলের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- মসলার পরিচিতি ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ফলের পরিচিতি

নিষিক্ত হওয়ার পরে ফুলের গর্ভাশয় অংশ বিশেষ পরিপুষ্ট, পরিবর্ধিত ও বিকশিত হয়ে ফলে পরিণত হয়। অর্থাৎ এক কথায় নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয়ই ফল। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এগুলোকে প্রকৃত ফল বলে। সব সময় আবার নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয় থেকে ফল উৎপন্ন হয় না। নিষেক ছাড়া গর্ভাশয় বিশেষ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ পার্থেনোজেনিটিকভাবে বা ডিম্বক সরাসরি ফলে পরিণত হয়। এসব ফলে বীজ থাকে না। যেমন : গর্ভাশয় ছাড়াও সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জুরী ফলে রূপান্তরিত হতে পারে এগুলোকে অপ্রকৃত ফল বলে। আমরা বলতে পারি প্রকৃত বা অপ্রকৃত ফল পরিণত বা পাকা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া হয় তাদেরকে উদ্যানতাত্ত্বিক ফল বলে। উদ্যানতত্ত্বের যে শাখায় ফল নিয়ে আলোচনা করে তাকে ফল বিজ্ঞান বা পোমোলজি (Pomology) বলে।

ফলের গুরুত্ব

মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে ফল যেহেতু রান্না করে খাওয়া হয় না বলে সমস্ত পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ গ্রহণ করে। খাদ্য হিসেবেই নয়, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, সামাজিক কর্মকান্ডে ইত্যাদিতে ফল বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে। ফল চাষের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। পুষ্টি সরবরাহে ফলের অবদান :
সব ফলেই সব ধরণের পুষ্টি উপাদান কমবেশি আছে। বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হলো ফল। কোন ফলে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান অধিক রয়েছে তা থাকে তা বর্ণনা করা হলো-
শর্করা : কিসমিস, খেজুর, আম, কলা, বেল, কাঁঠাল।
চর্বি : কাজু বাদাম, অ্যাভেকেডো, বাদাম, কাঁঠাল বীজ ইত্যাদি।
খনিজ লবণ : খেজুর, কলা, লিচু, বেল, কাজুবাদাম।
ভিটামিন : ভিটামিন এ-পাকা আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, কমলা, খেজুর, ভিটামিন বি-১ (থায়ামিন)-কলা, কাজুবাদাম, ভিটামিন বি-২: বেল, পেপে, লিচু, আনার, ডালিম। ভিটামিন সি: আমলকী, পেয়ারা, কমলা, লেবু ও আনারস।
পানি- তরমুজ, নারিকেল, আনারস।

২। উৎপাদন বৃদ্ধিতে ফলের অবদান : দানাজাতীয় খাদ্য শস্যের গড় ফলনে চেয়ে ফলের গড় ফলন অনেক বেশি হয় ফলে কৃষক একক জায়গা থেকে লাভবান হয়।

৩। ফল চাষে পতিত জমি ব্যবহার : অনেক পতিত জমি, বসতবাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার পাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন জমি যেখানে মাঠ ফসল জন্মানো সম্ভব হয় না, শুধু ফল গাছ লাগিয়ে সেই সব জায়গার সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব।

৪। আয় বৃদ্ধিতে ফলের অবদান : দানা জাতীয় শস্য অপেক্ষা ফলের গড় ফলন বেশি তেমনি ফলের দামও অনেক বেশি। ফল চাষে কৃষক খাদ্য শস্যের চেয়ে ফল চাষে অনেক বেশি আয় করতে পারে। ফল বাগানে আন্তঃশস্য যেমন-আদা, হলুদ চাষ করে বাড়তি আয় করতে পারে।

৫। ঔষধ হিসেবে ফলে অবদান : বিভিন্ন প্রকার ফল ঔষধ হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন : পেটের পীড়ায় বেল ও পেঁপে খেতে বলা হয়। ত্রিফলা (আমলকি, হরিতকি ও বয়রা) বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফল ছাড়াও গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন: ছাল, পাতা, মূল ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬। নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ফলের অবদান: বিভিন্ন ফল ও ফলজাত দ্রব্যের উপাদানের জন্য নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। ফলের বাণিজ্যিক নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব। দেশে ফলের রস, আচার, স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলি ইত্যাদির জন্য নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান করলে বিদেশ থেকে এসব আমদানি করতে হবে না। এর ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এছাড়া বয়স্ক ফল গাছের কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি এবং ডালপালা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৭। জাতীয় অর্থনীতিতে ফলের অবদান: ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বিদেশ থেকে ফল ও ফলজাত আমদানী করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। যেখানে ফল ও ফলজাত দ্রব্য বাংলাদেশে উৎপন্ন হলে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৮। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ফলের অবদান: ফল গাছ রাস্তার দুধারে মাটি ক্ষয় রোধ করে, ছায়া প্রদান করে অতিবৃষ্টি ও ঝড়ের তীব্রতা কমায় ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

মসলার পরিচিতি ও গুরুত্ব

খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করার জন্য যেসব ফসল ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলোকে মসলাজাতীয় ফসল বলে। যেমন আদা, হলুদ, পিঁয়াজ, রসুন, ইত্যাদি। বাংলাদেশে কমপক্ষে ২৫ ধরণের মসলা ফসলের চাষ হয়। এর মধ্যে আদা, হলুদ, পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ ও ধনিয়াকে প্রধান ও অন্যান্য মসলা ফসলকে অপ্রধান হিসেবে গণ্য করা হয়। মসলার পুষ্টিমান ও ঔষধি গুণ অনন্য। খাদ্যকে সুস্বাদু করা ছাড়াও খাদ্য সংরক্ষণ ও এর গুণাগুণ রক্ষার্থে ব্যাপকভাবে মসলা ব্যবহৃত হয়।

মসলার শ্রেণীবিন্যাস :

১. মসলা ঃ যেমন- মরিচ, আদা, গোলমরিচ, ধনিয়া ইত্যাদি।

২. সুগন্ধি মসলা ঃ যেমন- এলাচ, তেজপাতা, জিরা, কালজিরা ইত্যাদি।

মসলা ফসলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

মসলা চাষ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। মসলা চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণে অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। বর্তমানে মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেট আকারে বাজারজাতকরণ হচ্ছে। সাথে সাথে বিদেশে রপ্তানি বাড়ালে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় সম্ভব হবে। আমাদের দেশে প্রতিবছর মসলা আমদানির জন্য অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। মসলা বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে, বেকারী ও প্রসাধন শিল্পে ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া বস্ত্রের রং, সুপানীয় ও সুগন্ধি প্রস্তুতিতে মসলা ব্যবহার করা হয়।

মসলা ফসলের ভেষজ গুরুত্ব

মসলার অনেক ওষুধিগুন রয়েছে। মসলা ঔষধ শিল্পেও ব্যবহার করা হয়। আদা-সর্দি কাশি, হজম শক্তি বাড়ানো ও বায়ুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হলুদ শরীরে সৌন্দর্যচর্চা, ক্ষত নিরাময় করে। রসুন-হৃদরোগ, উচ্চরক্ত চাপ, ব্যাথায় ভালো কাজ করে। জিরা-আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়, কালোজিরা-অনেক রোগে কাজ করে, পিঁয়াজ-ঠান্ডা কাশিতে চুলে ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ফুল ফল ও মসলার বাগান পরিদর্শন করে পরিচিতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দেবে।

সারাংশ

ফল বলতে নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয়কে বুঝায়। নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয় ছাড়াও বিশেষ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ পার্থোনোজেনিটিকভাবে বা ডিম্বক সরাসরি ফলে পরিণত হয়। এগুলোকে অপ্রকৃত ফল বলে। প্রকৃত বা অপ্রকৃত ফল

পরিণত বা পাকা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া হয় তাদেরকে উদ্যানতাত্ত্বিক ফল বলে। ফল যেহেতু রান্না করে খাওয়া হয় না তাই সমস্ত পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ গ্রহণ করে। এছাড়া ঔষধি হিসেবে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উদ্যানতত্ত্ব ফসলের মধ্যে যেসব ফসল শুধু ফুলের জন্য চাষ করা হয় তাকে ফুলজাতীয় ফসল বলে। বর্ষজীবী ফুলকে শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন ও উভয় মৌসুমের এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। ফুল চাষের জন্য আমাদের দেশের আবহাওয়া বেশ উপযোগী তাই ফুল চাষ করে উৎপাদিত ফুল বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় এবং আত্মকর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হয়। খাদ্য দ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করার জন্য যেসব ফল ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে মসলা জাতীয় ফসল বলে। যেমন-আদা, হলুদ, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। মসলা বিভিন্ন ধরণের ঔষধ, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে বেকারী, প্রশাধন, পানীয় ও ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মশলা ফসল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সুগন্ধি মসলা কোনটি?

ক) মরিচ　　খ) এলাচ

গ) পিঁয়াজ　　ঘ) হলুদ

পাঠ-৩.২ কলা চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কলার জমি ও জাত নির্বাচন করতে পারবেন;
- জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি জানতে পারবেন;
- কলার বংশ বিস্তার মাধ্যম ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জানবেন।

ভূমিকা

কলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। শুধু বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এটি অন্যতম একটি ফল। কলা জনপ্রিয়, সস্তা ও সুস্বাদু ফল। এতে মানবদেহের প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কলার অনেক জাত সেগুলো সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কলা গাছের গুঁড়ি কন্দ মাটির নীচে থাকে এটিই আসল কান্ড। পাতাগুলি শক্ত ও ঘনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভুয়াকান্ডে পরিণত হয়।

কলার জমি নির্বাচন

কলার জন্য পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা আছে এমন জমি কলা চাষের জন্য উপযোগী। তবে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা আছে এমন জমি উত্তম।

জাত নির্বাচন

পৃথিবীতে অনেক চাষযোগ্য জাত রয়েছে। বাংলাদেশে কলার জাত সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. পাকা অবস্থায় খাওয়ার উপযোগী কলা

২. আনাজী বা সবজি কলা

১। পাকা অবস্থায় কলার জাত হল- অমৃত সাগর, সবরী, অগ্নীসর, মেহের সাগর, চাম্পা, চিনি চাম্পা, কবরী, এঁটে কলা (বীজযুক্ত কলা)।

২। আনাজী কলা গুলো হল- ভেড়ারভোগ, চোয়াল পউশ, বেহুলা, মন্দিরা ইত্যাদি।

জমি তৈরি

কলার মূল ততটা গভীর না হলেও বিস্তারশীল। মাটিতে শিকড় যাতে ভালোভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে সেজন্য ভালো করে তৈরি করে নিতে হবে। এরপর ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে কাঠি পুঁতে রোপণের অবস্থান ঠিক করে নিতে হবে। কাঠিকে কেন্দ্র করে ৫০ সে.মি.× ৫০ সে.মি. গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হয়। ১০-১৫ দিন গর্ত উম্মুক্ত রাখতে হবে। উপরের মাটির সাথে জৈব সার মিশিয়ে গর্তে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

কলা গাছে প্রতি বছরে ১২ কেজি গোবর সার, ইউরিয়া ১২০ গ্রাম, টিএসসি ২৫০ গ্রাম, এমপি ১২০ গ্রাম, জিপসাম ১১০ গ্রাম এবং জিংক সালফেট ২৫ গ্রাম দেয়ার জন্য বলা হয়ে থাকে। জমি তৈরি শেষ হলে অর্ধেক গোবর জমিতে ছিটিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা রোপণ করলে ২৫০০ গাছের জন্য হেক্টরে ৩০ টন গোবর সার প্রয়োজন। বাকি অর্ধেক গোবর সার, সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট চারা রোপণের আগে মাটির সাথে মিশাতে হবে। চারা রোপণের দুই থেকে চার মাস পরে অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ফুল আসার আগে গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

বংশ বিস্তার

কলার বংশ বৃদ্ধি সাধারণতঃ অযৌন উপায়ে মাটির নীচ থেকে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে। দুই প্রকারের সাকার উৎপন্ন হয়-

১। সোর্ড বা অসি সাকার: এটি প্রশস্ত গুড়িকন্দ, পাতাগুলি সরু বা তরবারি আকৃতির। এগুলো মাতৃ গুড়িকন্দ থেকে উৎপন্ন হয়।
২। পানি বা ওয়াটার সাকার : এর পাতাগুলি চওড়া, গুড়িকন্দ ছোট। এটি মাতৃ গুড়িকন্দের গুড়িকন্দের গভীরে পার্শ্বমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়।

চিত্র: ৩.২.১: সোর্ড সাকার

চিত্র: ৩.২.১: পানি বা ওয়াটার সাকার

চারা নির্বাচন

বংশ বৃদ্ধির জন্য সোর্ড সাকার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। কারণ সোর্ড সাকারে গাছের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট খাদ্য জমা থাকে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

যে কোন সময় চারা রোপণ করা যায় তবে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর পর্যন্ত চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। কারণ এ সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকে। পূর্বে তৈরিকৃত গর্তের ঠিক মাঝখানে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের গভীরতা ১৫-২০ সে.মি. হলে ভালো। তবে চারাটি মাতৃ গুড়িকন্দের সাথে মাটিতে যত গভীরে ছিল, ঠিক ততটুকু গভীরে রোপণ করা উত্তম।

আগাছা দমন

গাছের বৃদ্ধির প্রথম পর্যায় বিশেষ করে ৩-৪ মাস কলা বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। যেহেতু মূল মাটির অল্প গভীরে থাকে সেজন্য আগাছা গাছের বৃদ্ধিকে ব্যহত করে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিতে হবে। কলার জমি একেবারে শুকিয়ে যেতে দেয়া উচিত নয়। প্লাবন বা নালা যে কোন পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা বর্ষার সময় পানি জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

রোগ দমন

কলার পানামা রোগ (*Fusarium wilt*) একটি মারাত্মক রোগ। অমৃতসাগর ও সবরিতে এ রোগের আক্রমণ বেশী। এটি মাটি বাহিত রোগ। এ রোগে প্রথমে নিচের পাতা হলুদ হয়ে যায়, দ্রুত রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছ মারা যায়। আক্রান্ত গাছ মাটিসহ উপড়ে ফেলতে হবে। একই জমিতে ৩-৪ বছর কলাগাছ না করাই ভালো।

পোকা দমন

কলার পাতা এবং ফলের বিটল এর পূর্ণাঙ্গ পোকা কচি পাতা বা কচি ফল এর উপরে নরম অংশ চেঁচে খেয়ে ফেলে। সুতরাং কাদি বের হওয়ার পরপর সবুজ পলিথিন দ্বারা বা অন্য কোন স্বচ্ছ ব্যাগ দ্বারা কাদি ঢেকে দিতে হবে। এতে সূর্যালোকে গরম বাতাস-ধুলোবালি পোকার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং থোড় কেটে দিতে হবে। এছাড়া ১০ গ্রাম কার্বোফ্যুরান গাছের চারদিকের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সাথী ফসল চাষ

চারা রোপনের ১ম ৪/৫ মাস বলতে গেলে জমি ফাঁকাই থাকে। এ সময় কলাবাগানে অর্ন্তবর্তী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়া শসা ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি (মূলা, পালং শাক, মরিচ, ছোলা, মসুর, বরবটি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাল শাক, ডাটা) চাষ করা যেতে পারে।

খুঁটি/ঠেস দেওয়া

কলা গাছে ছড়া আসার পর বাতাসে গাছ ভেঙ্গে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাঁশ বা গাছের ডাল দিয়ে খুঁটি বেঁধে দিলে ছড়া ভেঙ্গে পড়া রোধ হয়।

অতিরিক্ত চারা (সাকার) কর্তন

কলাগাছের গোড়া হতে নতুন সাকার/চারা বের হয়ে থাকে। কলাগাছে ছড়া বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই সাকার রাখা উচিত নয়। সাধারণত: দু'এক মাস পরপর এসব চারা মাটির সমান করে কাটা দরকার। কাদি সম্পূর্ণ বের হওয়ার পর মুড়ি ফসলের জন্য গাছ প্রতি মাত্র একটি চারা রেখে বাকিগুলো কাটতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফুল বের হবার ৯০ থেকে ১৩০ দিনে কলা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। কলা পরিপক্ক হলে এর শিরাগুলো সমান হয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে সবুজ রং ধারণ করে। এরকম অবস্থায় কাদি কেটে নামানো হয়। কাদি বা ফানাগুলোকে ঘরে উপর রেখে তারপর খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এতে কলা সমানভাবে পাকে ও রং চমৎকার হয়।

ফলন: হেক্টর প্রতি সাধারণত: ২০-২৫ টন ফলন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী কলার বংশবিস্তারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাকার সনাক্ত করে এর চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

কলার মানবদেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কলা গাছের গুঁড়ি কন্দ মাটির নীচে থাকে, এটিই আসল কান্ড। বাংলাদেশে কলার জাত সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) পাকা অবস্থায় খাওয়ার উপযোগী কলা (২) আনাজী বা সবজি কলা অযৌন উপায় মাটির নীচ থেকে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে। ফুল বের হবার ৯০ থেকে ১৩০ দিনে কলা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাকা অবস্থায় কলার জাত কোনটি?
(ক) অমৃত সাগর (খ) বেহুলা
(খ) চয়াল পৌউশ (ঘ) ভেড়ারভোগ

২। কলার চারা কত দূরত্ব পরপর লাগানো উচিত-
(ক) ২ মি. × ২ মি. (খ) ৪ মি. × ৪ মি.
(গ) ২ মি. × ৩ মি. (ঘ) ৩ মি. × ৩ মি.

৩। পাতা চিকন, প্রশস্ত গুঁড়ি কন্দ কোন প্রকারের সাকার?
(ক) সোর্ড সাকার (খ) পানি সাকার
(গ) সোর্ড ও পানি সাকার (ঘ) ওয়াটার সাকার

৫। কলার মারাত্মক রোগ কোন্‌টি?

ক) পানামা রোগ
খ) লেইট-ব্লাইট রোগ
গ) ব্লাক মোল্ডরট
ঘ) এনথ্রাকনোজ রোগ

৬। কলার পাতা ও ফলের বিটল থেকে রক্ষার জন্য কি দ্বারা ঢেকে দিতে হয়?

ক) কালো পলিথিন দ্বারা
খ) স্বচ্ছ নীল পলিথিন দ্বারা
গ) চটের বস্তা দ্বারা
ঘ) খড় দ্বারা

পাঠ-৩.৩ পেয়ারার চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পেয়ারার জাত, বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- পেয়ারার জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- পেয়ারা চাষ পদ্ধতি জানতে পারবেন।

পেয়ারা একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। পেয়ারায় প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে। পেয়ারা দ্বারা জ্যাম, জেলি তৈরি হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গাতেই এই ফলের চাষ হয়ে থাকে। তবে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, গাজীপুর এবং পার্বত্য অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে কলার চাষ হয়ে থাকে।

পেয়ারার জাত: বাংলাদেশে পেয়ারার জাতগুলো হল- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা থেকে উদ্ভাবিত জাত যেমন- কাজী পেয়ারা, বারি পেয়ারা-২। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাউপেয়ারা-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত জাত- ইপসা পেয়ারা। এসব জাতের পাশাপাশি অন্যান্য জাতগুলো হলো- স্বরূপকাঠি, কাঞ্চনগর, থাই পেয়ারা, মুকন্দপুরী ইত্যাদি। পেয়ারার পুষ্টিউপাদান নিম্নের ছকে দেখানো হলো:

চিত্র ৩.৩.১ : পেয়ারা

উপাদান	পরিমাণ
জলীয় অংশ (গ্রাম)	৮১.৭
মোট খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	০.৭
হজমযোগ্য আঁশ (গ্রাম)	৫.২
খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরী)	৫১
আমিষ (গ্রাম)	০.৯
চর্বি (গ্রাম)	০.৩
শর্করা (গ্রাম)	১১.২

উপাদান	পরিমাণ
ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	১০
লৌহ (মি. গ্রাম)	১.৪
ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	১০০
ভিটামিন বি১ (মি. গ্রাম)	০.২১
ভিটামিন বি২ (মি. গ্রাম)	০.০৯
ভিটামিন সি (মি. গ্রাম)	২১০

জলবায়ু ও মাটি

যেকোনো আবহাওয়াই পেয়ারা চাষ করা যায়। তবে পেয়ারার জন্য ২৩-২৮° সে. তাপমাত্রা ভালো। অধিক বৃষ্টিপাতে পেয়ারার স্বাদ পানসে হয়। বার্ষিক ১০০ থেকে ১০২ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। ফুল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া উত্তম। পেয়ারা সব মাটিতে ভালোভাবে জন্মায় তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সুনিষ্কাশিত উর্বর জমি পেয়ারা চাষের জন্য উত্তম।

বংশবিস্তার

পেয়ারা সাধারণত বীজ ও কলম দিয়ে বংশবিস্তার করা হয়। বীজ থেকে ফল আসতে দেরি হয়। বীজের গাছে গুণগত মান ঠিক থাকে না। তাই কলমের চারা লাগানোই উত্তম। পেয়ারার সাধারণত গুটি কলম, জোড় কলম দিয়ে চারা তৈরি করা হয়। এর মধ্যে গুটি কলমই জনপ্রিয় পদ্ধতি।

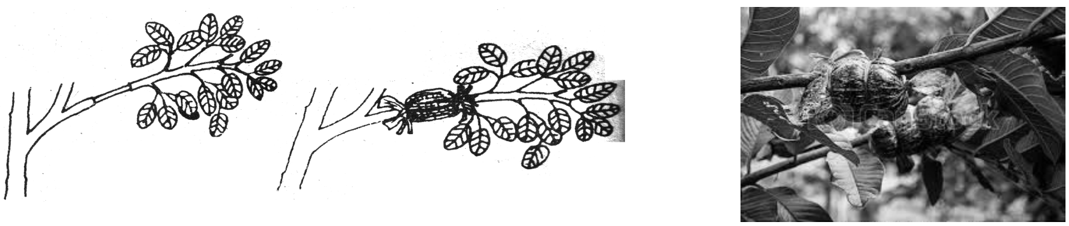

চিত্র ৩.৩.২ : পেয়ারার গুটি কলম

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমিতে কয়েকবার চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হয়। তারপর ৫০ সে.মি. × ৫০সে.মি × ৫০ সে.মি আকারের এবং ৫ মিটার × ৫ মিটার দুরে দুরে গর্ত তৈরি করতে হবে। এরপর প্রতি গর্তে ২০-২৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২০০ গ্রাম এমপি সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পূর্ণ বয়স্ক গাছে ১০ কেজি গোবর সার, ইউরিয়া টিএসপি, এমপি ২০০ গ্রাম করে বছরে দুইবার মার্চ-এপ্রিল মাসে, বাকি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপন

পেয়ারার চারা সাধারণত: মে থেকে জুলাই মাসে লাগানো ভালো। তবে সেচের ব্যবস্থা থাকলে যেকোনো সময় লাগানো যেতে পারে। গর্তের মাঝখানে চারা বসিয়ে চারদিকে মাটি চাপা দিতে হবে। চারার সাথে খুঁটি বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে।

সেচ ও আন্তঃপরিচর্যা

প্রয়োজন মাফিক ও নিয়মিত সেচ দিলে পেয়ারার ফল বড় ও ফলন ভাল হয়। মাটিতে রসের অভাব হলে ফুল-ফল ঝরে পরে। শুষ্ক মৌসুমে হালকা সেচ দিতে হবে। পেয়ারা সংগ্রহের পর হালকা ছাটাই করতে হবে। গাছের গোড়া থেকে শাখা বের হয় তা ছেঁটে ফেলতে হবে। শুষ্ক, রোগাক্রান্ত ও মরা ডাল কেটে দিতে হবে।

রোগ ও পোকা মাকড় দমন

রোগদমন

পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগ: ইহা একটি ছত্রাকজনিত রোগ। পেয়ারার পাতা, কান্ড, শাখা ও ফল আক্রান্ত হয়। প্রথম দিকে পেয়ারার গায়ে ছোট ছোট বাদামি দাগ হয় তা ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফলের শাঁস শক্ত হয় এবং ফল ফেটে যায়। গাছের নিচে আক্রান্ত পাতা ও ফল পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি.লি. অনুপাতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

পেয়ারা ঢলে পড়া রোগ: এ রোগ হলে প্রথমে পাতা হলুদ রং ধারণ করে। গাছের আগা শুকিয়ে যায় এবং মারা যায়। এ রোগ হলে গাছ গোড়াসহ তুলে ফেলতে হবে।

ডাই ব্যাক (ডগা মরা): গাছের কচি ডাল শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত ডালে বর্দোপেষ্ট বা বর্দোমিশ্রণ (১%) স্প্রে করা যেতে পারে।

পোকা দমন: পেয়ারা গাছে মিলিবাগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। এ পোকা পাতা চুষে খায়। আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া পেয়ারার ক্ষতিকর পোকা হল মাছি পোকা। এদের কীড়া ফল ছিদ্র করে ফলে প্রবেশ করে ফলের শাঁস খেতে থাকে। এ পোকা দমনে উপযুক্ত ব্যবস্থা হল পেয়ারা ব্যাগিং করা। এছাড়াও আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। ফল পাকার তিন মাস থেকে সঠিক কীটনাশক প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

ফল আহরণ

পেয়ারা গাছে বছরে দুবার ফুল আসে। মার্চ এপ্রিলে একবার এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আরও একবার ফুল আসে। ফুল বের হওয়া থেকে ফল আহরণের উপযুক্ত হতে সময় ৪-৫ মাস লাগে। ফল সবুজ থেকে হলদে সবুজ রং ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন

ভালো জাত, যেমন কাজী পেয়ারার বা বারি পেয়ারা ২ গড়ে ১৩০ কেজি এবং ১০০ কেজি ফলন দিতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পেয়ারার চাষবাদ পদ্ধতি বর্ণনা করবেন।

সারাংশ

পেয়ারা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি সুস্বাদু ফল। পেয়ারার জন্য ২৩°-২৮° সে. তাপমাত্রা উত্তম। সুনিষ্কাশিত উঁচু দোআঁশ মাটি উপযোগী। পেয়ারা সাধারণতঃ গুটি কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করা হয়। পেয়ারা এ্যানথ্রাকনোজ, ঢলে পড়া, ডাইব্যাক রোগে আক্রান্ত হয়। ফলের মাছি পোকা, মিলি বাগ পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। ফল হলদে সবুজ রং ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পেয়ারার জন্য কত দূরে দূরে গর্ত তৈরি করতে হবে?

ক) ৫ মি. × ৫ মি. খ) ৩ মি. × ৩ মি.

গ) ২ মি. × ২ মি. ঘ) ১০ মি. × ১০ মি.

২। পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ কি ধরনের রোগ?

ক) ব্যাটেরিয়া জনিত খ) ছত্রাকজনিত

গ) ভাইরাসজনিত ঘ) পরজীবী ঘটিত

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

জাকির ৩ বিঘা উঁচু জমিতে ধান চাষ করেছিলেন কিন্তু ধানে তেমন লাভ করতে না পারায় চিন্তায় পড়ে গেলেন। তার এক আত্মীয় তাকে উন্নত জাতের পেয়ারা চাষ করতে বললেন। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে পেয়ারা চাষ শুরু করলেন।

৩। জমির ধানের বদলে কি চাষ শুরু করলেন?

ক) পেয়ারা খ) কাঁঠাল

গ) আলু ঘ) ধান

৪। জাকির পেয়ারা চাষ শুরু করলেন কেন?

i) পেয়ারার দাম বেশি ii) উঁচু জমি ধান চাষে অনুপযোগী

iii) উৎপাদন খরচ কম।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৪ পিঁয়াজ চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পিঁয়াজের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি, জাত ও বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পিঁয়াজের জলবায়ুগত চাহিদা ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পিঁয়াজের চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

পিঁয়াজ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত মসলা জাতীয় ফসল। সবজি ও সালাদ হিসেবে এবং আচার, কেচাপ ও সস তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এর অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে। ক্ষত প্রতিষেধক হিসেবে এবং সর্দি-কাশি, আমাশয়, উচ্চ রক্তচাপ, পেটফাঁপা ইত্যাদি নিরাময়ে পিঁয়াজ ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি

পিঁয়াজ একটি দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ। তবে আমাদের দেশে এর একবর্ষজীবী জাতও দেখা যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Allium cepa.* পিঁয়াজের রূপান্তরিত কান্ড সংলগ্ন পাতার গোড়ায় খাদ্য জমাটের ফলে স্ফীত হয় এবং কান্ডের সাথে একটির পর একটি সংযোজিত হয়ে শল্ককন্দ উৎপাদন করে। এ শল্ককন্দ পিঁয়াজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে নতুন গাছ জন্মে থাকে। পিঁয়াজের ফুল উভলিঙ্গী, ফল ক্যাপসুল জাতীয় এবং বীজের রং কালো।

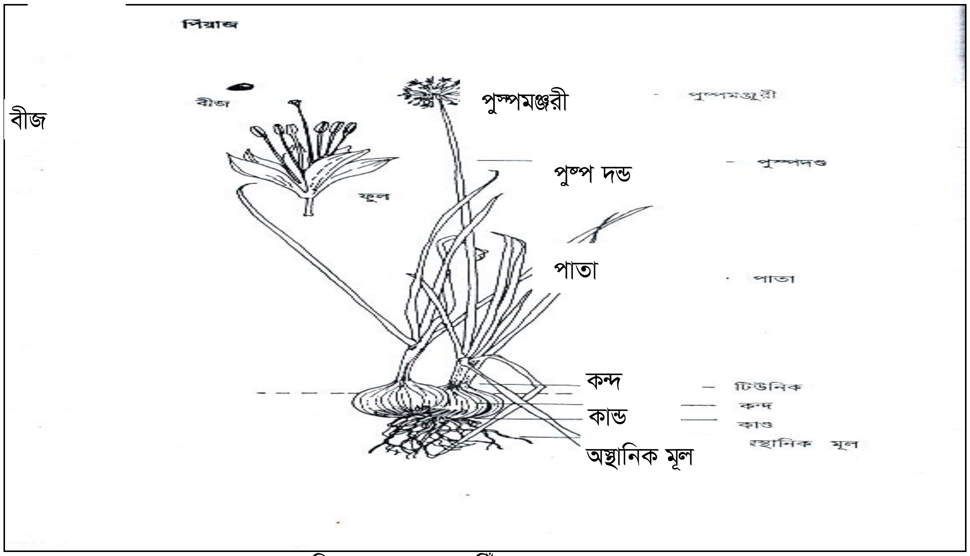

চিত্র ৩.৪.১ : (ক) পিঁয়াজের ফুলসহ গাছ

জাত

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জাতের পিঁয়াজ দেখা যায়। পিঁয়াজ আকার, আকৃতি, রং, ঝাঁঝ, বাণিজ্যিক ব্যবহার ও পরিকপক্কতার সময় অনুসারে বিভিন্ন রকম হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি পিঁয়াজ- ১, ২ এবং ৩ নামে পিঁয়াজের তিনটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। এদের মধ্যে বারি পিঁয়াজ- ১ শীতকালে এবং বারি পিঁয়াজ-২ ও ৩ গ্রীষ্মকালে চাষের উপযোগী। পিঁয়াজের স্থানীয় জাতের মধ্যে তাহেরপুরী, ফরিদপুর ভাটি, কৈলাশনগর অন্যতম।

বংশবিস্তার

বীজতলায় চারা উৎপাদন করে জমিতে রোপণ, সরাসরি ক্ষেতে বীজ বপন বা ছোট ছোট কন্দ রোপণ সাধারণত এ তিনটি পদ্ধতিতে পিঁয়াজের চাষ করা হয়। এদের মধ্যে চারা রোপণ পদ্ধতিতে পিঁয়াজের ফলন বেশী হয়।

জলবায়ু ও মাটি

সহনশীল তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত দিনের আলো ও মাটিতে রস থাকলে পিঁয়াজের ভাল ফলন পাওয়া যায়। এঁটেল মাটি ছাড়া অন্য যে কোন মাটিতে পিঁয়াজের চাষ করা যায়। তবে দোঁআশ ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা দোআঁশ বা পলিযুক্ত মাটি পিঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম। পিঁয়াজের ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। মাটির অম্লত্ব বা pH ৫.৮-৬.৫ পিঁয়াজ উৎপাদনের জন্য উত্তম, অধিক ক্ষার বা অম্ল মাটিতে পিঁয়াজের আকার ছোট হয় ও পুষ্ট হতে বেশী সময় লাগে।

উৎপাদন মৌসুম

বাংলাদেশে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে অর্থাৎ সারা বছরই পিঁয়াজ চাষ করা সম্ভব। শীতকালীন পিঁয়াজ অক্টোবর থেকে জানুয়ারী, গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজ ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই এবং বর্ষাকালীন পিঁয়াজ জুলাই থেকে অক্টোবর মাসে চাষ করা যায়।

জীবনকাল

চারা রোপণের ৯০ থেকে ১০৫ দিন পর পিঁয়াজ তোলার উপযুক্ত হয়।

বীজতলা

বীজতলা ৩ মি. × ১ মি. মাপের এবং ১৫-২০ সেমি. উঁচু হতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে চারা রোপণের জন্য ৩ মি. × ১ মি. আকারের ১২০-১৩০ টি বীজতলার প্রয়োজন হয়। প্রখর সূর্যের তাপ এবং ভারী বৃষ্টিপাতের হাত থেকে বীজতলার বীজ ও চারা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শেডের ব্যবস্থা করতে হয়। সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য বীজতলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নালার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

বীজ বপন

শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পিঁয়াজ চাষের জন্য যথাক্রমে অক্টোবর থেকে নভেম্বর, ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ এবং জুন থেকে জুলাই মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয। ৩ মি. × ১ মি. মাপের একটি বীজতলায় ২৫-৩০ গ্রাম বীজ লাগে। বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজ ২ গ্রাম ভিটাভেক্স দ্বারা শোধন করে বীজবাহিত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

বীজের হার

প্রতি হেক্টর জমিতে চাষের জন্য চারা রোপণ পদ্ধতিতে ৩-৪ কেজি বীজ, সরাসরি ক্ষেতে বীজ বপন পদ্ধতিতে ৬-৭ কেজি বীজ এবং শল্ককন্দ (পিঁয়াজ) রোপণ পদ্ধতিতে কন্দের আকার অনুযায়ী প্রায় ১.২-১.৫ টন শল্ককন্দের (পিঁয়াজের) প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি

৪-৫ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে আগাছা বেছে, মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ও সমতল করে জমি তৈরি করতে হয়। সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার্থে জমিতে মাঝে মাঝে ৫০ সেমি. প্রশস্ত নালা রাখতে হয়।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের সঠিক মাত্রা মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে। মধ্যম উর্বর জমিতে পিঁয়াজ চাষের জন্য হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নরূপ–

সারণী ১: পিঁয়াজ চাষে হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ

সারের নাম	মোট পরিমাণ	জমি শেষ চাষের সময়	রোপণের ২৫ দিন পর	রোপণের ৫০ দিন পর
পচা গোবর	১০ টন	১০ টন	-	-
ইউরিয়া	২৬০ কেজি	১৩০ কেজি	৬৫ কেজি	৬৫ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি	২০০ কেজি	-	-
এমপি	১৬০ কেজি	৮০ কেজি	৪০ কেজি	৪০ কেজি
জিঁপসাম	১০০ কেজি	১০০ কেজি	-	-

মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে সারের উপরি প্রয়োগের পর জমিতে প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে।

চারা/কন্দ রোপণ

৪৫-৫০ দিন বয়সের পিঁয়াজের চারা ১৫ × ১০ সেমি দুরত্বে রোপণ করা হয়। উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য সুস্থ ও সবল চারা রোপণ করা উচিত। চারা রোপণের গভীরতা ৩-৪ সেমি এবং একটি করে চারা লাগাতে হবে। কন্দ রোপণ পদ্ধতিতে সমতল জমিতে অগভীর নালা করে ২০-২৫ সেমি দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ১০-১৫ সেমি অন্তর কন্দ লাগানো হয়। চারা বা কন্দ রোপনের পরই সেচ দেওয়া আবশ্যক।

রোগবালাই ও পোকামাকড়

পেঁয়াজের প্রধান রোগগুলোর মধ্যে পার্পল ব্লচ, লিফ ব্লাইট, অ্যানথ্রাকনোজ, বালব রট প্রধান। পার্পল ব্লেচ রোগ বীজবাহিত। সুতরাং বীজ বপনের পূর্বে শোধন করে নিতে হবে। পেঁয়াজের ক্ষতিকর পোকামাকড় হচ্ছে থ্রিপস, মাছি ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ডায়াজিনন স্প্রে করতে হবে।

চিত্র ৩.৪.২ : পেঁয়াজের লিফ ব্লচ

আগাছা দমন

জমি নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা করে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এতে কন্দ ভালভাবে গঠিত হয় ও ফলন বাড়ে।

সেচ ও নিকাশ

মাটির রস স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে পিঁয়াজের ফলন কমতে থাকে। এজন্য পিঁয়াজের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। চারা মাটিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ৩ দিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। কন্দ গঠিত হয়ে গেলে সেচ কম লাগে। পিঁয়াজ উত্তোলনের ৩ সপ্তাহ পূর্ব থেকে সেচ বন্ধ রাখতে হয় নতুবা পিঁয়াজের গুণাগুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। সেচ প্রয়োগের ৩০-৬০ মিনিট পর সেচের অতিরিক্ত পানি নালা দিয়ে বের করে দিতে হবে। পিঁয়াজের সম্পূর্ণ জীবন চক্রে ৮-১০ বার সেচের প্রয়োজন হয়। সেচের পর জমিতে চটা বাঁধলে তাতে গাছের মূলে বাতাস চলাচল ব্যহত হয়। এজন্য চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। পিঁয়াজ মোটেই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। এজন্য জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

প্রতিবার পিঁয়াজ ক্ষেতে নিড়ানির পর ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হয়। পিঁয়াজের কন্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফুলের কলি বের হওয়ার সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, গ্রেডিং ও সংরক্ষণ

পিঁয়াজ গাছ পরিপক্ক হলে এর পাতা হেলে পড়ে। যখন ৭০-৮০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে নেতিয়ে বা ভেঙ্গে পড়ে তখন পিঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। উজ্জ্বল রৌদ্রযুক্ত দিনে পিঁয়াজ উত্তোলন করলে সংরক্ষণ ভাল হয়। পিঁয়াজ উত্তোলনের পর এর পাতা ও শিকড় কেটে বায়ু চলাচল সুবিধাযুক্ত শীতল ও ছায়াময় ঘরের মেঝেতে ৮-১০ সেমি উঁচু করে ৮-১০ দিন ছড়িয়ে রেখে দিলে পিঁয়াজ শুকিয়ে যায়।

আকারের উপর ভিত্তি করে পিঁয়াজকে মোটামুটি ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

ক) ৪-১০ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট বড় আকারের পিঁয়াজ
খ) ৩-৫ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট মাঝারী আকারের পিঁয়াজ
গ) ৩ সেমি এর কম ব্যাস বিশিষ্ট ছোট আকারের পিঁয়াজ

সুস্থ ও সবল পিঁয়াজ বাছাই ও গ্রেডিং করার পর বাঁশের মাচা, ঘরের সিলিং, প্লাস্টিক বা বাঁশের তাক অথবা ঘরের পাকা মেঝেতে শুষ্ক ও বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে পিঁয়াজ ছড়িয়ে সংরক্ষণ করা যায়। মাঝে মাঝে পচা ও অঙ্কুরিত পিঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হয়। কোল্ড স্টোরেজে ৭-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৬২-৬৭% আর্দ্রতায় পিঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। পঁচা ও অঙ্কুরিত পিয়াজ সরিয়ে ফেলতে হবে।

ফলন

আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরন করে পিঁয়াজের হেক্টরপ্রতি ১০-১৩ টন ফলন পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পিঁয়াজের জাত ও বংশবিস্তার এবং চাষাবাদ পদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারাংশ

পিঁয়াজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মসলা জাতীয় ফসল। এটি একটি দ্বিবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এর শল্ককন্দ ফসল ও বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া পিঁয়াজের আসল বীজ থেকেও চারা উৎপাদন করে পিঁয়াজের চাষ করা হয়। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন পিঁয়াজ চাষের জন্য যথাক্রমে অক্টোবর থেকে নভেম্বর, ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ এবং জুন থেকে জুলাই মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। ৪০-৫০ দিন বয়সের পিঁয়াজের চারা ১৫ × ১০ সেমি দুরত্বে রোপণ করা হয়। কন্দ রোপণ পদ্ধতিতে ২০-২৫ সেমি দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ১০-১৫ সেমি অন্তর কন্দ লাগানো হয়। জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। পিঁয়াজ উত্তোলনের ৩ সপ্তাহ পূর্ব থেকে সেচ বন্ধ রাখতে হয়। পিঁয়াজ ক্ষেতে নিড়ানির পর ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হয়। পিঁয়াজের কন্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফুলের কলি দেখা যাওয়া মাত্রই ভেঙ্গে দিতে হবে। যখন ৭০-৮০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে বা নেতিয়ে বা ভেঙ্গে পড়ে তখন পিঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। শুষ্ক ও বায়ু চলাচলযুক্ত স্থানে পিঁয়াজ ছড়িয়ে সংরক্ষণ করা যায়। কোল্ড স্টোরেজে পিঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। পিঁয়াজের হেক্টরপ্রতি ১০-১৩ টন ফলন পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কত দিন বয়সের পিঁয়াজের চারা রোপণ করা উচিত?
ক) ৪৫-৫০ দিন খ) ৫০-৬০ দিন
গ) ৬০ দিনের বেশি। ঘ) ২০-৩০ দিন

২। পিঁয়াজ উত্তোলনের কমপক্ষে কত দিন পূর্বে সেচ বন্ধ করা উচিত?
ক) ২ সপ্তাহ খ) ৩ সপ্তাহ
গ) ৪ সপ্তাহ ঘ) ৫ সপ্তাহ।

৩। কখন পিঁয়াজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়?
ক) ৫০-৬০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে গেলে খ) ৬০-৭০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে গেলে
গ) ৭০-৮০% পাতার অগ্রভাগ শুকিয়ে গেলে

৪। প্রতি হেক্টর জমিতে পিঁয়াজ চাষের জন্য কি পরিমাণ শল্ক কন্দের প্রয়োজন হয়?
ক) ১.২-১.৫ টন খ) ১.৮-২.০ টন
গ) ২.২-২.৪ টন

পাঠ-৩.৫ রসুন চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রসুনের জাত, বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- রসুনের জলবায়ু ও মাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- রসুনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

রসুন একটি গুরুত্বপূর্ণ মসলাজাতীয় ফসল। রসুনের অনেক ঔষধিগুণ রয়েছে। এটি মাংস, তরকারি, আচার, চাটনি, স্যুপ ও সস তৈরিতে ব্যবহার হয়। এছাড়াও ইনসেকটিসাইড, এন্টিব্যাকটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার হয়। রসুন পেটের পীড়া, আমাশয়, হৃদরোগ ও মানুষের শরীরে কোলেস্টেরল কমাতে বিশেষ উপকারী।

জলবায়ু ও মাটি

বাংলাদেশে রসুন সাধারণত: শীতকালে চাষাবাদ করা হয়। রসুনের জন্য ঠান্ডা ও কুয়াশা মুক্ত এবং প্রচুর সূর্যালোক প্রয়োজন। বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে ১৫° সে. এর নীচে তাপমাত্রা না হলে গাছের কন্দ উৎপাদনে প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে বাল্ব বা কন্দ বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘদিবস ও শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন। উর্বর দোআঁশ মাটি রসুন চাষের জন্য উপযোগী। এঁটেল মাটি, অধিক অম্লীয় ও ক্ষার মাটি রসুন চাষের জন্য উপযুক্ত নয়।

চিত্র ৩.৫.১ : রসুন গাছ

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরির জন্য ৫-৭ টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। জমিকে খন্ডে ভাগ করে নিতে হবে। খন্ডের মাঝে পানি অপসারনের জন্য নালা তৈরি করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ সার প্রয়োগ করলে ফলন ভালো হয়। রসুনের জন্য প্রতি হেক্টর জমিতে ৫-১০ টন গোবর/ কম্পোস্ট, ২৫০-৩০০ কেজি ইউরিয়া, টিএসপি ২০০-২৫০ কেজি, এমপি ৩০০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। জমি প্রস্তুতের সময় অর্ধেক ইউরিয়া, সম্পূর্ণ গোবর, অর্ধেক টিএসপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া দুই কিস্তিতে সমানভাগে চারা লাগানোর ৩৫ দিন এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। বোরাক্স ও জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করলে রসুনের ফলন ভালো হয়।

বীজ হার

বীজের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ৩০০-৪০০ কেজি রসুনের কোয়া প্রয়োজন হতে পারে। রসুনের উৎকৃষ্ট, বড়, পোকামাকড় ও রোগজীবাণুমুক্ত কন্দ বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তবে মোটামুটি ১ গ্রাম ওজনের কোয়া হলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

রোপণ পদ্ধতি

দুই পদ্ধতিতে রসুন রোপণ করা যায়।

ক) ডিবলিং পদ্ধতি : এক্ষেত্রে নরম মাটিতে বা জমিতে সুতা দ্বারা লাইন করে রসুনের কোয়া মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

খ) ফারো পদ্ধতি : সুনিষ্কাশিত উর্বর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটিতে লাঙ্গল দ্বারা সোজা নালা করে ৩-৪ সে.মি. গভীরে কোয়া রোপণ করা হয়। এটি রসুন চাষে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। রোপণের জন্য সারি থেকে সারি ১৫ সে.মি. এবং ৭-১০ সে.মি. দুরে দুরে কোয়া রোপণ করা উচিত।

আন্তঃপরিচর্যা

রসুনের জন্য কন্দ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সাথে মাটি ঝুর ঝুরে করে গোড়ায় দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রসুনের গোড়ায় কোন ক্ষতি না হয়। জমিতে কচুরিপানা বা ধানের খড় দ্বারা মালচিং করলে মাটির রস সংরক্ষিত থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে সেচের তেমন প্রয়োজন হবে না। জমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পরিমানমত ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। তবে রসুন সংগ্রহের এক মাস আগে সেচ বন্ধ করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় দমন

রসুনের ক্ষতিকর পোকামাকড়ের মধ্যে থ্রিপস্ ও মাইট উল্লেখযোগ্য। থ্রিপস গাছের পাতার রস চুষে খেয়ে তার উপর লম্বা সাদা দাগ সৃষ্টি করে। পরে পাতার অগ্রভাগ বাদামি হয়ে শুকিয়ে যায়। পোকা দমনের জন্য ১০০০ লিটার পানিতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ১ লিটার মিশিয়ে এক হেক্টর জমিতে স্প্রে করলে সহজেই এ রোগ দমন করা যায়।

গোড়া পঁচা, পার্পল ব্লচ ও পাতা ঝলসানো রোগ হতে পারে। রসুনের ক্ষেত্রে গোড়া পঁচা রোগ হলে গোড়ার অংশ পঁচে যায়। এক্ষেত্রে ডাইথেন এম ৪৫ বা পেনকোজেব রোগনাশক স্প্রে করতে হবে। পার্পল ব্লচ রোগ ছত্রাকের আক্রমণে হয়ে থাকে। এক রোগের ফলে প্রথমে ছোট ছোট দাগ পড়ে এবং পরে বিস্তার লাভ করে। ছোট ছোট দাগগুলি একত্রিত হয়ে বড় বাদামি দাগ হয়ে পাতা শুকিয়ে যায়। এক্ষেত্রে ২ গ্রাম রোভরাল ৫০ কেজি ডাব্লিউপি ১ লিটার পানিতে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও কর্তন

রসুন গাছের পাতা বাদামি রং ধারণ করলে, পাতা ভেঙ্গে পড়লে, কন্দের বাইরের দিকে কোয়াগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠলে দুই কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যাবে তখন বুঝতে হবে যে ফসল তোলার সময় হয়েছে। বপনের ৪-৫ মাসের মধ্যে রসুন সংগ্রহের উপর্যুক্ত সময়। হাত দিয়ে গাছ টেনে তুলে মাটি ঝেড়ে পরিষ্কার করে ছায়াতে শুকাতে হবে।

রসুন সংরক্ষণ : রসুন ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানোর পর দেখা যাবে কন্দের উপরে গলা সরু ও সংকুচিত হয়, এই পরিবর্তনকে কিউরিং বলে। কিউরিং এর ফলে রসুন দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। আলো বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে কয়েকটি রসুন পাতা সহ এক সংগে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রসুন চাষের ফলে যে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায় তার উপর শিক্ষার্থী প্রতিবেদন তৈরি করবে।

সারাংশ

রসুন একটি গুরুত্বপূর্ণ মসলাজাতীয় ফসল। একটি বহু ঔষধিগুন রয়েছে। প্রতি হেক্টরে ৩০০-৪০০ কেজি রসুনের কোয়া প্রয়োজন। মোটামুটি ১ গ্রাম ওজনের কোয়া প্রয়োজন। বপনের ৪-৫ মাসের মধ্যে রসুন সংগ্রহের সময়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রসুন চাষের জন্য উত্তম পদ্ধতি কোন্টি?

ক) ডিবলিং পদ্ধতি খ) ফারো পদ্ধতি

গ) ছিটানো পদ্ধতি ঘ) কোনটিই নয়

২। কোন্ পোকা রসুনের পাতার রস চুষে খেয়ে লম্বা সাদা দাগ সৃষ্টি করে-

ক) ফলের মাছি পোকা খ) থ্রিপস্

গ) মাইটস্ ঘ) কান্ড ছিদ্রকারী পোকা

৩। কত গ্রাম ওজনের কোয়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়?

ক) ১ গ্রাম খ) ২ গ্রাম

গ) ৩ গ্রাম ঘ) ৪ গ্রাম

পাঠ-৩.৬ আদা চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আদার জাত ও বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- আদার জলবায়ুগত চাহিদা ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- আদার চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

আদা একটি প্রয়োজনীয় মসলা ফসল যা খাবারকে সুস্বাদু করে। আদা বাড়ির পাশে পতিত জমি, পাহাড়ে চাষাবাদ করা যায়। বিভিন্ন ফসলের সাথে আন্তঃফসল হিসেবেও চাষ করা যায়। আদার বিভিন্ন ঔষধিগুণ রয়েছে যেমন : পেটের পীড়া, আমাশয়, সর্দি কাশি নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

জাত : বাংলাদেশে আদার তেমন কোন জাত নেই। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি আদা-১ নামে একটি উফসী জাত রয়েছে। কৃষকরা সাধারণত স্থানীয় জাত চাষ করে থাকে।

চিত্র ৩.৬.১ : আদার কন্দসহ গাছ

জলবায়ু ও মাটি

আদার বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া উপযোগী। আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানেও আদার চাষ ভালো হয়। সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ মাটিতে ভালো ফলন হয়। তবে এটেল দোআঁশ মাটিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

আদার জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে জমি গভীরভাবে ৫-৬ টি চাষ দিতে হবে। আগাছা বা আবর্জনা পরিষ্কার করে মাটি ঝুর ঝুরে করে সমতল করে নিতে হবে। আদার জন্য গোবর সার ১০ টন, ইউরিয়া ২৫০-৪০০ কেজি, টি এসপি ১৫০-১৮০ কেজি, এমপি ১৬০-১৮০ কেজি হেক্টর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির সময় গোবর সার, টিএসপি, অর্ধেক এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক এমপি সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৪০-৫০ দিন পর এবং ২য় কিস্তি ৯০-১০০ দিন পর এবং বাকিটুকু ১২০-১৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

রোপন পদ্ধতি

আদার ১-২ কূঁড়ি বিশিষ্ট কন্দ মার্চ থেকে মে মাসে রোপন করতে হবে। সাধারণত ১৫-২০ গ্রাম ওজনের কন্দ প্রতি গর্তে ১টি করে ৪০-৫০ সে.মি. সারি থেকে সারি, গাছ থেকে গাছে ২৫ সে.মি. দূরত্বে ৫ সে.মি. গভীরে রোপন করতে হবে। বীজ রোপনের পর ঝুর ঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আদা রোপনের পর গাছ ও শিকড় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে মাতৃ আদা তুলে নিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না বরং আর্থিক লাভবান হওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে পিলাই তোলা বলে।

আন্তঃপরিচর্যা

আদার জমি আগাছামুক্ত থাকা প্রয়োজন। আগাছা পরিষ্কার করার সময় মাটি ঝুর ঝুর করে গাছের গোড়ায় দিতে হবে এবং সারের উপরি প্রয়োগও একসাথে করতে হবে। আদার জমিতে ১৫ দিন পরপর সেচ দেওয়া ভালো। তবে অতিরিক্ত পানি যাতে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আদার সাথে অন্যান্য ফসল অথবা ফলজ বৃক্ষ যেমন নারিকেল, সুপারি, কাঁঠাল বাগানে আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা যায়।

রোগ ও পোকা মাকড় দমন

কন্দ পচন বা রাইজোম রট রোগ আদার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। ব্যাভিস্টিন বীজ কন্দ দিয়ে শোধন করে ও শুকিয়ে জমিতে লাগাতে হবে। একই জমিতে বার বার আদার চাষ না করা ভালো।

বর্ষার শুরুতে পাতা ঝলসানো রোগ দেখা যায়। প্রথমে পাতায় ডিম্বাকৃতি ফ্যাকাসে দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে দাগগুলি একত্রিত হয়ে বিস্তার লাভ করে এবং পাতা শুকিয়ে যায়। ডাইথেন এম-৪৫ ২.৫ গ্রাম এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। আদার পোকা মাকড়ের মধ্যে কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা ক্ষতি করে থাকে। এক্ষেত্রে সঠিক কীটনাশক প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ

আদা লাগানোর ৭-১০ মাস পর পাতা ও গাছ হলুদ হয়ে শুকিয়ে গেলে ফসল তোলার উপযোগী হয়। সাধারনতঃ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে আদা তোলা হয়। আদা তুলে শিকড় ও মাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে তারপর শীতল ও আলো পূর্ণ এলাকায় আদা সংরক্ষণ করতে হবে। ফলন হেক্টর প্রতি ১৫-৩০ টন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা আদা রোপন পদ্ধতি ও মাতৃ আদা তোলার কৌশল মাঠে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

সারাংশ

আদা খাবার সুস্বাদুকারী মসলা জাতীয় ফসল। এর বহু ঔষধিগুণও রয়েছে। আদার জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া উপযোগী। আদা মার্চ-এপ্রিল মাসে বপন করতে হয়। আদার গাছ বৃদ্ধি পেলে মাতৃ আদা তুলে নেয়া যায়। একে পিলাই তোলা বলে। ফলন হেক্টর প্রতি ১৫-৩০ টন হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আদা কোন্ মাসে লাগানো হয়?

ক) জুন-জুলাই খ) ডিসেম্বর-জানুয়ারি
গ) মার্চ-মে ঘ) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

২। পিলাই তোলা কি?

ক) মাতৃ আদা তুলে ফেলা খ) আদা রোপন করা
গ) আদার রোগ ঘ) আদার পোকা

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ ঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ ঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ ঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ ঃ